যে আগুন ছড়িয়ে যাবে সবখানে

নবনীতা তপু

সময়ের প্রয়োজনে কোনো কোনো শব্দ বা শব্দমালা অনেক ক্ষেত্রে কাঁটাতারের বেড়া, দেশ ও কালের গণ্ডি অতিক্রম করে হয়ে ওঠে বিশ্বজনীন। সে শব্দ বা শব্দমালার অনুরণন আর অভিঘাত আলোড়ন তোলে হাজার বছরের অনুশাসন, কুসংস্কারাচ্ছন্নতা আর অন্ধকারের সমুদ্রে। যাপিত জীবনের অনেক অব্যক্ত কথামালার সাবলীল প্রকাশ আমাদের সাহসী করে তোলে। সে সত্যের প্রকাশ আপাতদৃষ্টিতে প্রথা ও সংস্কারবিরোধী বলে মনে হলেও দীর্ঘকালের অচলায়তনে কুঠারাঘাত করতে যে শাণিত শক্তি, উদ্যোগ ও দম্ভোক্তি উচ্চারিত হওয়া প্রয়োজন তা যে শালীন, পলিস বা তথাকথিত সমাজপতিদের প্রেসক্রিপশন মোতাবেক হবে তা আশা করা বাতুলতা মাত্র। বরং সে শব্দমালা হবে চাবুকের আঘাতের মতো ক্ষুরধার, তীরের আঘাতের মতো তীক্ষ্ণ আর অশনির মতো কর্ণবিদারী।

আমার দৃষ্টিতে সাম্প্রতিক বিশ্বে সর্বাধিক উচ্চারিত #মি-টু এমনই এক বিস্ফোরণমুখর কবিতা। সুনামির তীব্রতায় যা বিশ্বের ৮৫টিরও বেশি দেশের লক্ষ কোটি নারীর মনোজগৎকে আন্দোলিত করেছে, উদ্বেলিত করেছে। আজ সময় এসেছে আমার প্রিয় স্বদেশে রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বেগম রোকেয়া, ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী, হুমায়ুন আজাদের উত্তরসূরিরা আঘাতে আঘাতে ভাঙবে পুরুতান্ত্রিকতার অচলায়তন, আগুন ছড়িয়ে যাবে সবখানে।

১৯৯৭ সালে কৃষ্ণাঙ্গ সমাজকর্মী তারানা বুর্কি কর্তৃক সূচিত হবার বেশ আগেই বাংলাদেশে মি-টু আন্দোলন শুরু করেছিলেন মুক্তিযোদ্ধা ও ভাস্কর ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী। হয়ত ভিন্ন নামে, ভিন্ন প্রেক্ষাপটে অনেক বড়ো ক্যানভাসে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পুরুষের পাশাপাশি অনেক নারীও অস্ত্র হাতে শত্রুসৈন্যের সাথে যুদ্ধ করেছেন। পাশাপাশি অনেক নারী অবদান রেখেছেন যোদ্ধাদের সংগঠিত করা, কূটনৈতিক তৎপরতা চালানো, অস্ত্র-গোলাবারুদ এবং সংবাদ বহন, আহত যোদ্ধাদের চিকিৎসা ও সেবা-শুশ্রূষা প্রদান, শরণার্থীদের প্রতি মানবিক সেবা প্রদান, ক্ষুধার্ত যোদ্ধাদের খাদ্য সহায়তা প্রদান, প্রভৃতি ক্ষেত্রে। তা ছাড়া আমরা জানি, যে কোনো যুদ্ধে শুধু যোদ্ধারাই নয়, নারীর শরীরও প্রতিপক্ষের আক্রমণের বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। ফলে যুদ্ধকালে অনেক নারীকে তাদের শরীর দিয়েও যুদ্ধ করতে হয়। বাঙালির হাজার বছরের শ্রেষ্ঠতম অর্জন মুক্তিযুদ্ধের বিজয়গাথা রচিত হবার নেপথ্যেও এরকম ঘটনা রয়েছে। একদিকে তারা অস্ত্র হাতে লড়েছেন সম্মুখসমরে, অপরদিকে তাদের শরীরকে ক্ষতবিক্ষত করেছে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের দোসররা। এই অংশ নারীর অবদান সশস্ত্র যোদ্ধার চেয়ে কম না বেশি সে বিতর্কে না গিয়েও বলা যায়, এরা সবাই যুদ্ধাহত। বাংলায় এরকম যুদ্ধাহত নারী দুই লক্ষ (মতান্তরে আড়াই লক্ষ)। ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী তাদের অন্যতম। শত্রুর বিরুদ্ধে তাঁর শরীর-মনের যে যুদ্ধ এবং শত্রুর বিরুদ্ধে অনিঃশেষ ঘৃণা তা একাত্তরে মানবতার বিরুদ্ধে দাঁড়ানো যুদ্ধাপরাধীদের বিচারকে ত্বরান্বিত করেছে, বাংলাদেশকে সামনে এগিয়ে নিতে সাহায্য করেছে। বাংলার সকল যোদ্ধা নারীকে সম্মানিত করতে, আত্মবিস্মৃত জাতিকে আঘাতে আঘাতে জাগ্রত করতে প্রিয়ভাষিণী নিজেকে শঙ্কামুক্ত করে ঘুরে দাঁড়াবার প্রত্যয়ে বলেছিলেন, ‘এটাই তো আমার জীবন। আমি ওই সময়কে বদলে

দিতে পারি না। আমি কান্না দমন করেছি। নিজেকে স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করেছি। সবসময় ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে চলার চেষ্টা করেছি শুধু নারীদের রুখে দাঁড়াবার সাহস জোগাতে।' তাই তিনি নিঃসংকোচে তুলে ধরেছেন তাঁর ওপর ঘটে যাওয়া পাকিস্তানি বাহিনীর নির্মম নির্যাতনের ইতিহাস।

অবশ্য নীলিমা ইব্রাহিমের "আমি বীরাঙ্গনা বলছি" আরো আগেই ধারণ করেছে মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতিত নারীদের মাইলফলকতুল্য প্রামাণ্য ভাষ্য, যদিও্ ওই প্রকাশ নির্যাতিতদের নিজস্ব উদ্যোগে ঘটে নি। ওই দলিলের একটি চরিত্র কাঞ্চনমালা গর্বিত উচ্চারণে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে চিরাচরিত সমাজের পুরুষতান্ত্রিকতাকে : 'আমি তো স্বেচ্ছায় পাকবাহিনীর কাছে যাই নি। আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে গেছে। তখন কেন সমাজ আমাকে উদ্ধার করল না? তখন কোথায় ছিল এ সমাজ, কোথায় ছিল আমার স্বামী? যখন যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করলাম তখন আমি নষ্ট হলাম না, দেশ স্বাধীনের পরে যখন মুক্তিযুদ্ধে আমার প্রয়োজন শেষ, তখন নষ্ট হয়ে গেলাম! নারী হয়ে জন্মেছি বলে সকল দোষ আমার?'

সে কারণেই বলেছি– ভিন্ন আঙ্গিকে, ভিন্ন পরিবেশে বাংলাদেশে অনেক আগেই শুরু হয়েছিল নিজের প্রতি ঘটে যাওয়া নির্যাতনের কাহিনি তুলে ধরার আন্দোলন। আন্দোলন দানা বাঁধছিল, বারংবারই দানা বাঁধে। নারীরা সাহস নিয়ে রুখে দাঁড়ায়, যেমন তাঁরা দাঁড়িয়েছিল শহিদ জননী জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে গঠিত গণআদালতে সাক্ষ্য দেবার আলোকোজ্জ্বল মুহূর্তে। তাঁরা আশায় বুক বাঁধে, বারবার নানামুখী সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রতিবাদ করে। রাজনৈতিক আর রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য চাপ প্রয়োগের চেষ্টা করে। নির্যাতিত হয়, আপাতদৃষ্টিতে হারিয়ে যায় কিন্তু হেরে যায় কি?

রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন, উগ্র মৌলবাদের উত্থান, সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় স্বাধীনতাবিরোধীদের পুনর্বাসন, দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা বিচারহীনতার সংস্কৃতি, বুদ্ধিজীবী আর সংস্কৃতিসেবীদের রাজনৈতিকভাবে পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ, প্রভৃতি বহুবিধ সৈন্যসামন্ত সাজিয়ে রাষ্ট্র আর সমাজ নারীকে অবরুদ্ধ করার চেষ্টা করে। অনুষঙ্গ হিসেবে থাকে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোকে রাজনৈতিক ফায়দা লোটার উদ্দেশ্যে ব্যবহারের সফল অপচেষ্টা। নির্লজ্জ, গোয়ার, অমানবিক পুরুষতান্ত্রিক সমাজ আর রাষ্ট্র ব্যর্থ হয় বারংবার, কিন্তু প্রতিবারই নিত্যনতুন অস্ত্রে শাণিত করে নিজেদের, পৌনঃপুনিক আক্রমণে অবদমিত করে নারীকে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের সর্বাপেক্ষা সহিংস টার্গেট নারীসমাজ। দুই অক্ষরের এ 'নারী' শব্দটি বোধ করি নিজের বানানো অলীক বিধাতার পার্থিব প্রতিনিধি পুরুষের কাছে সর্বাপেক্ষা ঘৃণিত, তুচ্ছ, ভীতিকর, নিন্দিত আর ধর্ষিত শব্দ। প্রথাবিরোধী লেখক হুমায়ুন আজাদের ভাষায় বলি, 'পুরুষ নারীকে সাজিয়েছে অসংখ্য কুৎসিত অভিধায়, তাকে বন্দি করার জন্য তৈরি করেছে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র, উদ্ভাবন করেছে ঈশ্বর, নিয়ে এসেছে প্রেরিত পুরুষ, লিখেছে ধর্মগ্রন্থ, অজস্র দর্শন, কাব্য, মহাকাব্য, সৃষ্টি করেছে অসংখ্য শাস্ত্র। পৃথিবীতে বোধকরি এত অস্ত্র নিয়ে প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হয়নি কোনো অত্যাধুনিক সৈন্যবাহিনী।'

আজ তাই প্রতিক্রিয়াশীলতাই যখন সমাজের প্রধানতম রূপ, তখন এদেশের নারীরা ধীরে ধীরে এগোচ্ছে নাগপাশে আবদ্ধ বাঘবন্দির ছকে বাঁধা এক ভয়ংকর ভবিষ্যতের পানে। আমাদের কন্যাসন্তানেরা আজ তাদের নিবিড়তম নিঃশঙ্ক আশ্রয় পিতার কোলেও নিরাপদ নয়। আজ তাদের বেড়ে ওঠা এক ভীতিকর দৃষ্টিশূন্যতা নিয়ে। যে দৃষ্টিতে নেই ভবিষ্যতের স্বপ্ন, নেই পৃথিবীর সাথে লড়াই করে বেঁচে থাকার সাহস, আছে শুধু একটি রন্ধ্র নিয়ে বিব্রত জীবনযাপন। তা সে হোক চাষাবাদে নিযুক্ত নারী কিংবা তিন বছরের

শিশু, গার্মেন্টস শ্রমিক কিংবা ঝা-চকচকে অফিসের কর্মী। ঘরে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, যাত্রাপথে, কর্মক্ষেত্রে, বিনোদন মাধ্যমে, প্রশাসনের কাছে সকল ক্ষেত্রে নারী লৈঙ্গিক রাজনীতির শিকার। আর ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির কথা নাই-বা বললাম। এই ক্রমবর্ধমান নৃশংস পরিবেশে আরো একটি ভীতিকর ঘটনা ঘটছে– তা হলো, নারীর প্রতি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের পাশবিক আর কুসংকারাচ্ছন্ন অন্ধকার মানসিকতাকে সামনে আসা। ধর্মীয় রাজনীতিকে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে নারীর অধিকারের আন্দোলনকে প্রশ্নবিদ্ধ ও সমস্যাসংকুল করা এবং ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে নারীর ওপর ঘটে যাওয়া নিপীড়নের ঘটনাকে রাজনীতিকরণ করে ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে তাকে মোকাবিলার মাধ্যমে নারীর দীর্ঘকালীন সংগ্রামকে বিভাজিত করার অপচেষ্টা এবং অনেকাংশে সফল হওয়া।

বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া দুটি ঘটনার দিকে নজর দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে। যদিও ঘটনাগুলো কিছুদিন আগের। তবে ঘটনাপরম্পরায় বর্তমান সময়ে সমাজ বাস্তবতার কিছুমাত্র পরিবর্তন ঘটে নি। প্রথম ঘটনাটি মাসুদা ভাট্টি ও ব্যারিস্টার মঈনুল হোসেন সম্পর্কিত। ঘটনাটি ঘটল ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় সকলের চোখের সামনে। একদিন বিরতি নিয়ে কর্মকৌশল ঠিক করে নারী সাংবাদিকসহ সুশীল সমাজ একযোগে নিন্দা জানাল এ ঘটনার। একজন নারী শুধু নয়, মানুষ হিসেবে আমি প্রতিমুহূর্তে ধিক্কার জানাই ব্যারিস্টার মঈনুল হোসেনের মতো হীন চরিত্রের মানুষদের; যারা মনে করেন চরিত্র মানেই দৈহিক সতীত্ব অথবা নারী মাত্রেরই স্বাধীনতার সিদ্ধান্ত বা চরিত্রের সার্টিফিকেট দেবে পুরুষ। যারা মনে করেন নারী যেহেতু একরাশ বিকারের সমষ্টি, বিকৃত মানুষ কিংবা অসম্পূর্ণ সৃষ্টি তাই তাকে সর্বত্রই অপমানসূচক বাক্যে সম্বোধন করা যায়, তা হোক সে মিডিয়ার লক্ষ লক্ষ দর্শকের সামনে কিংবা নিজের বদ্ধ শয়নকক্ষে। মাসুদা ভাট্টি কৃত মানহানির মামলা আর খোলা চিঠিকে আমি একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে তখনো স্যালুট জানিয়েছি এখনো জানাই। কিন্তু তার পরের ঘটনাপ্রবাহ কি আর মাসুদা ভাট্টি, সুশীল বা নারীসমাজের হাতে থাকে? নাকি হয়ে ওঠে রাজনৈতিক হাতিয়ার! চারিদিকে গেল গেল রব, একের পর এক মামলা, মঈনুল হোসেন গ্রেপ্তার এবং ডিভিশনপ্রাপ্ত হয়ে জামাই আদরে সরকারি শ্বশুরালয়ে বসবাস, রাস্তায় রাস্তায় কিছুদিন মাত্র একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের নারীকর্মীদের ঝাড়ু মিছিল, সময় অতিবাহিত হবার সাথে সাথে নতুন কোনো ঘটনার দিকে জাতির দৃষ্টি নিবদ্ধ করবার চেষ্টা এবং সফলভাবে একটি সুশীল সমাজের আন্দোলনকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করার কাজে বিজয় অর্জন। সাধারণ দৃষ্টির বাইরে বেরিয়ে একটু ভাবলে কি মনে হয় না, ব্যারিস্টার মঈনুল হোসেন ক্ষমতার প্রতিনিধি বলে তাকে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়া বা দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী পদক্ষেপের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যই এতসব আয়োজন? এখানে গৌণ হয়ে গেছে নারীর অপমান। অনেক বেশি সামনে এসেছে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা কিংবা ক্ষমতার বলয়ের মানুষদের মধ্যকার সন্ধিচুক্তির শর্তরক্ষার চিরায়ত কৌশল।

এবার আসি দ্বিতীয় ঘটনায়। দ্বিতীয় ঘটনাটিও একই সময়ের। ঘটনাটি বিশ্লেষণ করলেই প্রথম ঘটনার অন্তর্নিহিত সত্যটি পরিষ্কার হয়ে যাবে। রাজধানীর একজন কর্মক্লান্ত নারী তার সারাদিনের কাজ শেষে বাড়ি ফিরছেন, পথ রোধকারী একজন পুলিশ। নারীটি তাকে নিজের ব্যাগ চেকসহ নিয়মতান্ত্রিকতার মধ্যে থেকে সকল প্রকার সহযোগিতার আশ্বাস দিলেও পুলিশের আচরণ পশুসুলভ। কথা আর আচরণ দিয়ে যত প্রকারের যৌন হয়রানি সম্ভব তা পুলিশ কর্তৃক করা হলো। ঘটনাটির ভিডিওচিত্র ধারণ করে পুলিশ কর্তৃক আপলোড করা হলো। তারপরের ঘটনা চিরাচরিত, পৌনঃপুনিক। প্রতিপক্ষকে ঘায়েল

করা বা রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার সুযোগ না থাকায় মেয়েটির মামলা না করার ইস্যুকে বড়ো অজুহাত হিসেবে সামনে আনা হলো। স্বাভাবিক নিয়মে গণমাধ্যমে সংবাদটি প্রকাশিত হওয়ায় তাৎক্ষণিক চাপ ঠেকাতে অভিযুক্ত পুলিশ সদস্যকে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো। তদন্তের ভার পেল অপর এক পুলিশ কর্মকর্তা। তারপর ভানুমতীর খেল, সবকিছু ভ্যানিশ। নেই কোনো মানহানির মামলার ঝড়, ঝাড়ু মিছিলকারীদের কাছে বিষয়টি ইস্যু বলে মনে না হওয়া কিংবা পুলিশ সদস্যদের বিরুদ্ধে আইসিটি অ্যাক্টে মামলা করবার কথা কারো মনেই না আসা। অদ্ভুতভাবে লৈঙ্গিক রাজনীতি আর জাতীয় রাজনীতি মিলেমিশে একাকার হয়ে যাওয়া। শিকার এক এবং একমাত্র সেই নারী।

তারপর দিন গড়িয়েছে বেশ কিছু। ক্যালেন্ডারের তারিখ পরিবর্তনের সাথে সাথে আমাদের দেখতে হয়েছে দগ্ধ নুসরাতের আর্তনাদ, ২ বছরের শিশু থেকে শতবর্ষী বৃদ্ধার ধর্ষিত হবার ঘৃণিত কাহিনিসহ প্রতিদিনকার নিত্যনতুন উপায়ে ঘটে যাওয়া বর্বরতার চিত্র। সবকিছুর মধ্য থেকে প্রাগুক্ত দুটি ঘটনার তুলনা উপস্থাপনের একটি মাত্র কারণ, নারীর ওপর ঘটে যাওয়া সকল প্রকার সহিংসতা, নির্যাতন কিংবা পশুসুলভ আচরণকে রাজনীতিকীকরণের মধ্য দিয়ে জায়েজ করবার বৈশ্বিক প্রচেষ্টাকে আরো একবার সামনে তুলে আনা। এখানে মনে রাখা দরকার, দুটি ঘটনাই কিন্তু রাজধানীর বুকে ঘটেছে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বাস করা যে নারীরা নিজেদের মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে তাদের অবস্থা তো আরো করুণ! আমরা যারা নিজেদের স্বাধীন সত্তাকে বাঁচিয়ে রাখতে চাই, তারা কিন্তু প্রতিদিনের চরিত্রহীন কিংবা বলতে পারেন প্রাত্যহিক লৈঙ্গিক রাজনীতির শিকার। ভাবনায় আরো রাখা প্রয়োজন যে, রাজধানীতে বসবাস করে একজন কর্মজীবী নারী হয়েও দ্বিতীয় ঘটনার ভিকটিম আমার বোনটি কিন্তু মামলা করার ধৃষ্টতা দেখায় নি। কারণ সে জানে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে যারা বসে আছেন, তারা সকলেই কমবেশি পুরুষতন্ত্রের প্রতিভূ। শয়তান পুরুষ বলে তার জন্যেও গোপন দরদ রয়েছে পুরুষের কিন্তু কোনো মায়া নেই নারীর জন্য। বিচার চাইতে গেলেই যৌন নিপীড়নের বাকি চক্রটিও একাধিকবার আবর্তিত হবে।

লৈঙ্গিক রাজনীতি সার্বক্ষণিকভাবেই সচেষ্ট থাকে নারীর অবদানকে অস্বীকৃতি জানিয়ে তার প্রত্যাশা আর প্রাপ্তির মধ্যে সমুদ্রসম ফারাক বিদ্যমান রাখতে। নারীর সংগ্রাম, ত্যাগ, তিতিক্ষা আর অর্জনের আকাঙ্ক্ষাকে উপর্যুপরি আঘাতে পর্যদুস্ত করতে। একটু ভাবনার জগতে নাড়া দিয়ে দেখুন, জাতি হিসেবে আমরা এতটাই অকৃতজ্ঞ যে, ২৬৬ দিনের সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রাম কিংবা তাঁর প্রস্তুতিপর্বের সকল অধ্যায়ের নারীর অবদানকে শুধু অন্ধকারেই রাখি নি, আলো আসবার সকল পথকেই করেছি অবরুদ্ধ।

কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেনের ভাষায় বলি, ‘বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নারীর জীবন অধ্যয়নের একটি বড়ো দিক। এই যুদ্ধে নারীর ভূমিকা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, নারী তার সর্বাত্মক শক্তি নিয়োগ করেছিল স্বাধীনতার মতো একটি বড়ো অর্জনে। এতে পুরুষের পাশাপাশি নারীর অংশগ্রহণ ছিল তার জীবন বাজি রাখার ঘটনা। অথচ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে নারীকে মূলধারায় স্থাপন না করার ফলে নারীর প্রকৃত ইতিহাস যথাযথভাবে মূল্যায়িত হয় নি। নারী এই মুক্তিযুদ্ধে যে গৌরবগাথা রচনা করেছিল তা ধর্ষিত এবং নির্যাতিত নারীর ভূমিকায় অদৃশ্য হয়ে আছে। অন্যদিকে নারীর যে নিজস্ব মুক্তির জায়গাটি অর্থাৎ একজন মানুষ হিসেবে সমাজ, পরিবার ও রাষ্ট্রে তার প্রতিষ্ঠা পাওয়ার বিষয়টিও হয়েছে দারুণভাবে উপেক্ষিত কেবল নয়, রীতিমতো অপমানিত!’

অথচ এই জনযুদ্ধের মধ্য দিয়ে নারীরা কী চেয়েছিল? একটি স্বাধীন ভূখণ্ড, দেশ ও জাতির অর্থনৈতিক মুক্তি নাকি চেয়েছিল তার চিন্তা ও বিবেকের মুক্তি, চলাফেরার স্বাধীনতা এবং একজন পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার ও প্রতিষ্ঠা পাওয়ার নিশ্চয়তা? ভেবে লজ্জিত হই, মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে জন্ম নেওয়া একটি দেশ জন্মলগ্ন থেকেই তার সন্তানদের অবদানকে অস্বীকারের মধ্য দিয়ে পথচলা শুরু করল। এ কৃতঘ্নতার শাস্তি কি বাহিত হবে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে? বোধ কি কখনো জাগ্রত হবে আমাদের? নাকি প্রিয়ভাষিণী, কাঞ্চনমালা বা জাহানারা ইমামের মতো দেশব্যাপী তুলতে হবে প্রতিবাদের ঝড়। এক নয়, লক্ষ মুখে বলতে হবে–

যদি কেউ কথা না কয়, ওরে ওরে ও অভাগা
যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে, সবাই করে ভয়–
তবে পরান খুলে
ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে॥...

একটি দৃশ্যপট। অপমানে, যন্ত্রণায় আর ঘৃণায় কুঁকড়ে যাওয়া একটি মেয়ে। জীবনের সমস্ত সাহস একত্রিত করে তার অভিভাবকের কাছে খুলে বলছে তার অপমানের ঘটনা। মনেপ্রাণে চাইছে বিহিত। চাইছে পাশে থাকুক পরিবার। চাইছে কিশোর বয়সে তার মনোদৈহিক জগতে যে আলোড়ন উঠেছে, ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে তার ভাবনার জগৎ, অমানিশায় ঢেকে গেছে চারদিক, সে অন্ধকারের পথ পেরিয়ে আসতে তার পাশে থাকুক বাবা, মা, ভাই, বোন কিংবা রক্তসম্পর্কীয়রা। একটানে খুলে ফেলুক আত্মীয় পরিচয়ের সেই জানোয়ারের মুখোশ। যার কারণে 'মানুষ' শব্দটি পরিণত হয়েছে নিতান্তই একটি গালাগাল-এ। কিন্তু সমাজের আরো অসংখ্য, অগণিত মেয়ের মতো তারও টুঁটি চেপে ধরা হয়েছে মুখ খোলার সাথে সাথেই। বলা হয়েছে– 'চুপ করো, মেয়েদের এসব বলতে হয় না'। মেয়ের কষ্টে হয়ত মা কেঁদেছেন, বাবার বোবাদৃষ্টিতে ঝরে পড়েছে অক্ষমতা, ছোট ভাইবোনেরা বুঝতে পারছে বড়ো বোনটির সাথে এমন কিছু হয়েছে যা অন্যায়, অনুচিত কিন্তু তাদের কিচ্ছুটি করার নেই। অক্ষম ক্রোধ আর যন্ত্রণায় কুঁকড়ে থাকা বাবা-মা মেয়েকে ক্রমাগত শিখিয়েছেন চুপ করে থাকবার মন্ত্র আর সহ্যশক্তি বাড়াবার পাঠ। এ দৃশ্য আমাদের কি খুব অপরিচিত? একটু চোখ ফেরান নিজের দিকে। এ বাস্তবতা আপনার আমার সবার। শুধু কি পরিবার? শিক্ষক, ধর্মগুরু, সহযাত্রী, সহকর্মী, তথাকথিত প্রগতিশীল সহযোদ্ধা, প্রতিবেশ-প্রতিজন কোথায় আপনি বা আমি নিরাপদ? আপনি কষ্টের ভাগীদার কাউকে করতে গেলে সে হয়ত পুনর্বার আপনার প্রতি ঘটে যাওয়া অন্যায়ের সুযোগ নেবে। এমনকি কাঠামোবদ্ধ নারীদের চোখেও এ কন্যাসন্তান, এ কিশোরী বা এ নারী পাপের জলন্ত অগ্নিকুণ্ড। কী করুণ দুর্ভাগ্য আমাদের! মাঝে মাঝে বোধহয় মানুষ হয়ে বাঁচতে চাওয়া নারীরা যেন কোনো সভ্য সমাজে নয়, ঘুরে বেড়াচ্ছে প্রাগৈতিহাসিক কোনো গহিন অরণ্যে; যেখানে দল বেঁধে ওত পেতে আছে পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার মানুষরূপী হায়েনার দল। রক্ষা নেই আড়াই বছরের শিশুর, রক্ষা নেই পঞ্চাশোর্ধ্ব বৃদ্ধার। একতাল মাংসপিণ্ড আর রন্ধ্রলোলুপ এ হায়েনাদের হাত থেকে রক্ষা নেই প্রিয়ভাষিণী, কাঞ্চনমালা, ইয়াসমিন, তনু, ফাহিমা, মহিমা, তৃষা, নুসরাতসহ প্রতিদিনের লক্ষ্মী, সরস্বতী আর দুর্গাদের। এ হাজারো নাম, লক্ষ মুখের ভিড়েই মিশে আছে আপনার-আমার নাম, আপনার-আমার প্রতি ঘটে যাওয়া নির্যাতনের ইতিহাস।

বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের তথ্য অনুযায়ী ২০১৪ সালের জানুয়ারি থেকে ২০১৮ সালের নভেম্বর পর্যন্ত দেশে ধর্ষণের শিকার ২৩২২ জন শিশু। অন্যান্য যৌন নিপীড়নের শিকার শিশুর সংখ্যা ৬৩৯ জন। ২০১৯ সালের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত এই ছয় মাসে বাংলাদেশে ৩৯৯ জন শিশু ধর্ষণ ও ধর্ষণচেষ্টার শিকার হয়েছে বলে জানিয়েছে বেসরকারি সংস্থা মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন। শিশু নির্যাতনের চিত্রই যদি এই হয় তবে দেশে সামগ্রিক ধর্ষণের সংখ্যা কত হবে তা সহজেই অনুমেয়। আর এই হাজারের ভিড় ঠেলে আলোর মুখ দেখে না কত লক্ষ কোটি নির্যাতনের ঘটনা শুধু পুরুষতন্ত্রের শেখানো 'চুপ করে থাকা'র শাসন আর লজ্জিত হবার চিরচেনা অভ্যস্ততায়। কিন্তু আর কতদিন?? আমরা কীভাবে আশা করতে পারি, যে সমাজ তার জন্ম ইতিহাস নির্মাতা নারীদের মূল্যায়ন করে না; যে সমাজ লৈঙ্গিক রাজনীতির বিস্তার ঘটায় জন্মক্ষণ থেকে শব ব্যবচ্ছেদ পর্যন্ত; আমরা কীভাবে ভাবব, সে সমাজে একদিন সমতার দিন নিজস্ব গতিতেই আসবে? আসবে না, আসতে পারে না। পরিবর্তনকে আনতে হয় স্পর্ধা দিয়ে, সত্যের সাহস দিয়ে, অধিকার বুঝে নেওয়া প্রখর দাবিতে। এই স্পর্ধা, এই সাহস এই দাবির নামই– মি-টু।

আজ সময় এসেছে মুখ ফুটে মনের কথা একলা বলবার। মনের গহিনে দীর্ঘদিন চেপে রাখা লজ্জা আর ঘৃণার কথা বলবার। সময় এসেছে সমাজের তথাকথিত ভদ্রতা, প্রগতিশীলতার মুখোশকে একটানে খুলে ফেলে দম্ভের আঙুল উঁচিয়ে বলবার– 'দেখো, এই সেই ভদ্রতার মুখোশ পরে সমাজে নেতৃত্ব দেওয়া অতি সজ্জন ব্যক্তি, যে আমার নারীত্বকে চরম অপমান করেছে।' হতে পারে সে আমার জন্মদাতা পিতা, কাকা, মামা, ভাই, বন্ধু, অতি আপন স্বজন কিংবা একান্ত বিশ্বাস। আমার কাছে তার একমাত্র পরিচয় সে বিকৃত পুরুষতান্ত্রিকতার প্রতিভূ। যার কাছে নারীদেহ মাত্রই এক সীমাহীন লোলুপতার নাম।

আজ হাজার বছরের সুপ্ত আগুনে ঘৃতাহুতি পড়েছে। নারীর ভেতর জমে থাকা ভয়, ঘৃণা, অপমান, অসম্মান, লজ্জা আর কষ্টগুলো জ্বলন্ত লাভার মতো, দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ছে দিক থেকে দিগন্তরে। আজ নারীকে বাধা দিয়ে, প্রতিহত করে কোনো লাভ নেই। আজ নারী বিচার চায় না সমাজের কাছে, প্রচলিত বিচার ব্যবস্থার কাছে। তারা আজ আর মাথা খুঁড়ছে না রাজনীতিকদের দরবারে, করুণা ভিক্ষা চাইছে না সমাজপতিদের ড্রইংরুমে। কেবল শত সহস্র বছর ধরে মনের ভেতর জমিয়ে রাখা ক্ষোভ আর ঘৃণাটুকু উগড়ে দিচ্ছে। আদায় করে নিতে চাইছে দিনের অধিকার, রাতের অধিকার, ন্যায্য প্রাপ্য আনন্দের অধিকার, মুক্তির অধিকার, আত্মনিয়ন্ত্রণ আর আত্মসম্মানের অধিকার। স্পর্ধিত উচ্চারণে বলছে–

দুই লক্ষ নারী সম্ভ্রমে পাওয়া আমার স্বাধীনতা
রাত্রি হলেই শেকল পরায় কোন সে পরাধীনতা
...
রাতের বেলা পথে নামলেই বেশ্যা বলে ডাকো
বেশ্যা তোমার মগজ, পুরুষ মগজ সামলে রাখো।

সমাজে যারা নিজেদের মানুষ হিসেবে দাবি করেন তাদের কাছে নিবেদন, সম্ভব হলে এই নীলকণ্ঠ নারীদের কষ্টের মিছিলে শামিল হোন। হাতে হাত রেখে বলুন, 'আজ নয়, কাল নয় পরশু, বিভাবরী সূর্য

উঠবেই'। 'ভয় নেই আমরা রয়েছি তোমাদের সাথে। আজ ভাঙো, ভেঙে ফেলো চুপ করে থাকবার, চুপ করিয়ে রাখবার সংস্কৃতি।'

আর যদি তা না পারেন তবে চুপ করে থাকুন। শুধু নারীকে থামতে বলবেন না। আজ জাগবে প্রিয়ভাষিণী, জাগবে কাঞ্চনমালা, জাগবে জাহানারা ইমাম, জাগবে প্রতিটি নিষ্পেষিত মুখ। আজ থামলে চলবে না, হেরে গেলে চলবে না, হারিয়ে গেলেও চলবে না। আজ আমরা হারলে হেরে যাবে মুক্তিসংগ্রাম, আজ আমরা হারলে হেরে যাবে লক্ষ-কোটি নির্যাতিতা। আজ আমরা হারলে হেরে যাবে বাংলাদেশ। তাই আজ শুধু কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে গর্জে উঠতে হবে–

জাগবার দিন আজ, দুর্দিন চুপি চুপি আসছে
. . .
পণ করো, দৈত্যের অঙ্গে হানব বজ্রাঘাত
মিলব সবাই একসঙ্গে
সংগ্রাম শুরু করো মুক্তির
দিন নেই তর্ক ও যুক্তির।

নবনীতা তপু সংস্কৃতিকর্মী। nabanita_tapoo@yahoo.com

তথ্যসূত্র

- নারী, হুমায়ুন আজাদ, অবতরণিকা, তৃতীয় সংস্করণ, আগামী প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ১৯৯২
- মুক্তিযুদ্ধ : নারী ও সংখ্যালঘু নারী, মণীষা মজুমদার, নারী ও প্রগতি, জুলাই-ডিসেম্বর ২০০৭, বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ